তৌহিদা তহু'র যুদ্ধে জিতে যাওয়া

নাহিন আশরাফ

জীবন নিয়ে হতাশ? মনে হচ্ছে নিজেকে দিয়ে কিছুই হবে না? আশেপাশের সব কিছু অন্ধকার লাগছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে ভয় করছে? আসুন তাহলে আপনার এই মন খারাপের সময়ে সাহসী একজন উদ্যোক্তার কথা বলি। যিনি জীবনের হাজারো বাধা অতিক্রম করে সফল হয়েছেন, তিনি তৌহিদা তহু। দেশীয় পোশাক উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশের সবার কাছে তিনি পরিচিত মুখ।

পরিবারের আট ভাইবোনের মধ্যে তৌহিদা চতুর্থ। জন্ম দিনাজপুরে, একদম ছোটবেলাটা তাই কাটে দিনাজপুরেই। বাবা চাকরিসূত্রে দিনাজপুরের একটি কলোনীতে থাকতেন। ১৯৭৬ সালে বাবা-মায়ের হাত ধরে চলে আসেন ঠাকুরগাঁও। সেখানে গিয়ে স্কুল জীবন শুরু করেন। ছোটবেলায় অসম্ভব চঞ্চল ও মেধাবী ছিলেন। স্কুল জীবনে নাচ, গান, কবিতা, অভিনয় সব কিছুতেই ছিলেন পারদর্শী। তাই তো দুষ্ট প্রকৃতির হলেও সকলেই তাকে খুব ভালোবাসত। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভেজা, লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে মায়ের মার খাওয়া কি নেই তার স্মৃতির ভাণ্ডারে। তাই তো নিজের শৈশবের কথা মনে করতে গিয়ে কিছুটা আবেগিও হয়ে যান। দুই চোখে স্বপ্ন নিয়ে পড়তে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে।

বিশ্ববিদ্যালয়েরও তার জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক, সবার মধ্যমনি ছিল বললেও ভুল হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয়, নাচ, গান ও নানা কারিকুলামের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। আড্ডা দিতে ও বন্ধুদের সাথে হইচই করতে খুব বেশি ভালোবাসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি খুব সুন্দর পরিপাটি হয়ে যেতেন। শাড়ি পরতেন, চোখে কাজল দিতেন ও খোঁপা করতেন। তাই তার নাম হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নায়িকা। হঠাৎই জীবনের মোড় ঘুরে যায়; এটা হয়তো প্রতিটা মানুষ সাথেই হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় তার জীবনে আসেন বিশেষ একজন মানুষ। তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, নাম মাহমুদ ইসলাম চৌধুরী, ডাকনাম মিশু। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুদর্শন ছেলে বললেও ভুল হবে না। খুব অল্প বয়সেই প্রেমে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তা নিয়ে হাজার জনের কাছে কথাও শুনতে হয়েছিল তার। হুট করে তার জীবনে যেমন প্রেম আসে, তেমন হুট করেই তারা দুইজন বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। দুই পরিবারের ইচ্ছাতেই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তৌহিদা তহু পা দেন নতুন আরেক জীবনে। বিয়ের পর আগের মতোই হোস্টেলে থাকতেন তহু আর মিশু থাকতেন ব্যাচেলর বাসায়। বিয়ের কিছুদিন পর প্রথম সন্তানের মা হন তহু। যেহেতু দুজনই

স্টুডেন্ট, তাই তিনি তার প্রথম সন্তানকে নিজের মায়ের কাছে দিনাজপুর রেখে আসেন। তহু ঢাকাতে পড়ালেখা করতে থাকেন। প্রথম কন্যার নাম রাখেন নৈঋতা। এরপর জীবন কেটে যেতে থাকে জীবনের নিয়মে।

তার গর্ভে যখন ২য় সন্তান আসে তখন তার স্বামী পাড়ি জমান আমেরিকারাতে। ঠিক এ পর্যন্ত গল্পটা খুব স্বাভাবিক ও সহজ মনে হলেও তার আসল যুদ্ধ শুরু হয় এখন থেকেই। স্বামী আমেরিকায় যাওয়ার পর থেকে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ফাটল ধরে যায় তাদের সাজানো সম্পর্কে। স্বামীর সাথে পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে পৃথিবীতে আসে তার ২য় সন্তান নম্র। তখন তহুর নতুন পরিচয় হয় 'সিংগেল মাদার'। দুই সন্তানকে নিয়ে শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই, নিজেদের পরিচয়ের লড়াই।

তহু অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যাদের বাবা থাকে না যেইসব সন্তান খুব অবহেলার মাঝে বড় হয়। কিন্তু সেটা তহু হতে দিবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। সন্তানদের বাবা-মায়ের ভরসাতে রেখে তহু ঢাকা এসে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। নিজের ছেলে মেয়েকে কাছে রাখার মতো অর্থ তার কাছে ছিল না। তাই তিনি কাজ শুরু করেন। যেভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তখন একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতেন তহু। দিনাজপুরে থাকা ছোট্ট দুই সন্তানের জন্য মায়ের মন কাঁদত সারাক্ষণ। পুরো সপ্তাহ অফিস শেষে বৃহস্পতিবার রাতে ছুটে যেতেন মায়ের কাছে। শুক্র-শনিবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে আবারও ফিরে আসতেন। তিনি চাকরি করতেন বাধ্য হয়ে। কারণ চাকরি তার একদম পছন্দ ছিল না। নিজে কিছু করার বাসনা মনে ছিল সবসময়। তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে একসময় লন্ডনে পাড়ি জমান পড়ালেখার জন্য, কিন্তু সেখানেও সন্তানদের ছাড়া বেশিদিন মন টিকছিল না। তাই আবার দেশে ফিরে আসেন।

এবার তিনি নতুন করে কিছু করার কথা ভাবেন, আর চাকরি করতে চান না। তহু ছোটবেলা থেকে মা বোনদের পোশাক ডিজাইন ও সেলাই করতে দেখতেন। তার মা সবসময় তাদের পোশাক তৈরি করে দিতেন। সেই থেকে তারও পোশাক ডিজাইনের প্রতি আগ্রহ হয়। তিনি চিন্তা করেন দেশীয় কাপড় নিয়েই কিছু করা যাক। এতে তাকে সাহায্য করেন তার বন্ধু মিজান। মিজানই তাকে বলেন, শিশুদের কিছু কাপড় বানাতে এবং তাকে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। যারা তার করা ডিজাইনের কাপড় বিক্রি করতো এবং বিনিময়ে তাকে কিছু টাকা দিত। এখানেও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। ঢাকা থেকে বস্তায় বস্তায় কাপড় তিনি দিনাজপুরে বাসে করে নিয়ে আসতেন এবং দর্জিদের সাথে বসে তিনি কাপড় বানাতেন। তহুর বাবা অভিযোগ করতেন, 'এতো পড়াশোনা করে শেষে দর্জি হয়ে গেলা'। তিনি কারো কোনো কথা কান না দিয়ে গ্রামীণ উদ্যোক্তার প্রডিউসার হিসেবে কাজ করতে থাকেন ও প্রশংসা কুড়াতে থাকেন।

তখন তহুর মনে হয় নিজের কিছু করলে কেমন হয়। জন্ম হয় 'তহু'জ ক্রিয়েশন'র। নিজের ডিজাইন করা পোশাক তিনি বিক্রি করতে থাকেন। ধীরে ধীরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকা ঈদ ফ্যাশনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। সেই আয়োজনে অংশ নিয়ে তিনি পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হন। ঈদ, পূজা, ফাল্গুন, বৈশাখ মানেই সবার কাছে ছিল তহু'জ ক্রিয়েশনের পোশাক। তহুর জীবনের মোড় ঘুরে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে তার সব স্বপ্ন পূরণ হতে থাকে। তহু'জ ক্রিয়েশনের প্রথম আউটলেট ওপেন হয় উত্তরাতে। একে একে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তার আউটলেট হয়, জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে চলে যান তিনি। পেতে থাকেন দেশের মানুষের ভালোবাসা। যে তহু একদিন টাকার অভাবে শাহবাগ থেকে শ্যামলী হেঁটে যেতেন সেই তহু একদিন নিজের টাকায় গাড়ি কিনেন। এভাবেই সফলতার যাত্রা চলতে থাকে ২০১৬ পর্যন্ত। জীবনের একটা জায়গায় এসে তার মনে হয় আর কত পরিশ্রম করব। সেই অল্প বয়স থেকে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত তিনি। এবার তিনি ভাবেন তার বিশ্রাম দরকার। তিনি তার সবগুলো আউটলেট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেন। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় অবসরে চলে যান। তিনি মনে করেন তিনি আজ সফল, তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। এতো মানুষের কাছে অপমানিত হয়েও তিনি থেমে যাননি। তিনি পেরেছেন। নিজের দুই সন্তানকে মানুষ করেছেন। নিজের ও তাদের জীবন গুছিয়েছেন। আর তার নতুন করে পাওয়ার কিছু নিয়ে, জীবন নিয়ে তার আর কোনো অভিযোগ নেই। তিনি বলেন, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কোনো কষ্ট আমায় ছুঁতে পারে না। শুধু অবাক হই এতটা পথ একাই পাড়ি দিয়েছি।